ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1820-1827
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.405

রামায়ণের আধ্যাত্মিক ধারণা: ঐশ্বরিক নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের মেলবন্ধন

সুফল মণ্ডল, *গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

ড. সুজয়কুমার মণ্ডল, *অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Ramayana composed by the great poet Valmiki is the most prominent among the four principal Aryan epics. Moreover, it is the pristine epic of the primordial poet. The Ramayana is the holder and carrier of human culture of India as well as of South East Asia. Our civilization and culture are cherished and observed under the aegis of this epic. The Ramayana acts as a spiritual guide to the morality of people, religiousness and to protect existential crisis. The events of Ramayana uphold divine principles and human value and it make the core of religion concrete. Lord Rama had steadfast trust for righteousness and truth, Sita upholds the concrete image of womanhood, honesty and a faithful wife, Lakshmna represents renunciation and bravery and Hanuman is the symbol of selfless loyalty and devotion. These characters broaden the path of communal harmony and spiritual upliftment. On the other side Indian Hindu philosophy and Buddhist philosophy preach that attachment and illusion lead people to wrong path. Consequently we get detached remotely from the realisation of worldly truth. Like the characters of Ramayana we become errant for impiety, pride and uncontrolled desire and finally we face fall. The Ramayana determines a set of duties for people. The characters of the Ramayana prove that how the giving up a personal interest leads to greater interest and help greater social upliftment. The path of communal harmony and spiritual upliftment broadens through love, affection and respect. We also get the ultimate lesson of life I.e death is the only true and beautiful. The battle of quality among the characters opens up the direction of moral and spiritual education in this stinking world.

Keyword: Spirituality, Sacrifice, Illusion, Consciousness, Interactions, self-realization

ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- প্রথমটি শ্রব্য কাব্য ও অপরটি দৃশ্য কাব্য। শ্রব্যকাব্যের মধ্যে অন্যতম হলো মহাকাব্য। এই মহাকাব্য কে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আর্ষ মহাকাব্য ও অপরটি কলাত্মক মহাকাব্য। আর্ষমহাকাব্যের মধ্যে প্রধান চারটি মহাকাব্য হলো রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি।

পৃথিবীর আদি কবির আদি কাব্য হল মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্য। সুপ্রাচীন অখণ্ড ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান- সূর্য বংশের রাজাদের কাহিনীকে অবলম্বন করে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

রামায়ণ শুধুমাত্র ভারতের চিরন্তন মহাকাব্য নয়, প্রায় সমগ্র বসুন্ধরার সর্বকালের সকল মানুষের কাছেই শ্রেষ্ঠ জীবন আদর্শ। ভারতবর্ষের মহৎ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক বক্তব্যকে রামায়ণের মধ্যদিয়ে বাল্মীকি প্রকাশ করেছেন। কবি তাঁর কল্পনায় মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের সুখ-দুঃখও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্ব মানবের চিরন্তন হৃদয়ের আবেগ ও জীবনের মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। এই কারণে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামের পর্ণকুটির থেকে শহরের অট্টালিকায় পরম যত্নসহকারে রামায়ণকথা পঠিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে ঘরে গ্রীষ্মকালের বারিধারার মতো শক্তি ও শান্তির বাণী বর্ষণ করে চলেছে আদি কাব্য রামায়ণ। ভারতবর্ষের সাধনা, সংকল্প ও আরাধনা এই আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণের মর্মবাণী। এই রামায়ণের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে আমাদের সুজলা সুফলা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজের কল্যাণকর দিকগুলি যা যুগের পর যুগ ধরে আদর্শের সঙ্গে মান্যতা পেয়ে এসেছে ভারতবর্ষের প্রতি মানুষের হৃদয়ে। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রামায়ণ মহাকাব্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, অভিনয়, শিল্প-স্থাপত্য ও অসংখ্য প্রবাদ এবং প্রবচনের মধ্য দিয়ে রামায়ণের গতি এখনও ফল্গু ধারার মত প্রবহমান। রামায়ণ কালীন সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান কালেও যেন জীবন্ত ফসিল রূপে আমাদের ভারতবর্ষে দৃশ্যমান, উজ্বল রবির ন্যায় সর্বত্র প্রতীয়মান। ভারতের সমাজ ব্যবস্থার উপর রামায়ণের প্রভাব সর্ব ধর্মকে ছাড়িয়ে গার্হস্থ্য ধর্মের মানবিক সম্পর্ক আজও আমাদের সমাজে আদর্শ রূপে গণ্য হয়।

রামায়ণ ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদের কাহিনী হলেও এর মূল ঘটনা মূলতঃ রাম ও রাবণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। রাম দশরথের প্রথম পুত্র, ভাগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। রামের জীবন চরিত দ্বারা মুলতঃ ধর্মের সারাংশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রামায়ণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সংমিশ্রণের দ্বারা মানুষের জীবনকে মহাজাগতিক আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। ভাগবান রামচন্দ্র তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে ধর্মের মুখ্য নীতি ও ধারাগুলোকে তুলে ধরেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে ভগবান রামচন্দ্রের সাহস, সততা, কর্তব্য, সম্মান ও সহানুভুতি প্রভৃতি গুণাবলীগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। রামায়ণের চরিত্রগুলি এখনও আদর্শরূপে আমাদের সমাজে বিদ্যমান, যা মানবিক বৈশিষ্ট্যচ্যুত ও হতাশাগ্রস্থ জীবনে আশার আলো সঞ্চার করে। রামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রাজা। তাঁর ধর্মের প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্য, হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আদর্শ মানবের অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা রূপে প্রতীয়মান। অন্যদিকে সীতা নারিশক্তির প্রতীক, হনুমান নিঃস্বার্থ সেবা, বন্ধুত্ব ও আনুগত্যকে মূর্ত করে তোলে। রামায়ণের প্রতিটি চরিত্র জীবনের গভীরতা ব্যক্ত করে, যা পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবন ও তাদের মূল্যবোধকে আধ্যাত্মিকতার মার্গে যাত্রা করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় রামায়ণের চরিত্রগুলি ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরও আলোকপাত করে। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার শিক্ষা আমরা রামায়ণে পাই। তেমনই রামায়ণ তুলে ধরে জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করার জন্য আত্মত্যাগ, সমর্থন ও ভালবাসার মাহাত্ম্য। এই কাব্যের শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত নয়, পারিপার্শ্বিক লোকজন এবং সমাজকেও প্রভাবিত করে, যার ফলে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই কাব্যের শিক্ষনীয় বিষয়গুলি ব্যক্তিগত আচরণ ব্যতীত বিস্তৃত বৃহত্তর সমাজেরও মঙ্গল সাধন করে। রামায়ণের শিক্ষণীয় বিষয়াদি হাজার বছর আগেও যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, আজও তেমনি মানব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মার্গ নির্দেশ করে।

রামায়ণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে ধর্মের সুগভীর ও জটিল ধারণা। এটি দায়িত্ব-কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক আচার-আচরণের ধারণাকে প্রকাশিত করে। ধর্ম নিছক কিছু আদেশ বা নির্দেশের

সমষ্টি নয়, এটা নিজের জন্য, সমাজের জন্য ভাল কিছু নীতি নিজের মধ্যে ধারণ করা, যার দ্বারা একটি সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গড়ে তোলা যায়। রামায়ণে ধর্মকে অত্যন্ত অপরিহার্য নির্দেশক নিয়ম-নীতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যেটি বাধা-বিঘ্নময় হতাশাগ্রস্থ জীবনে একান্ত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু সামাজিক নিয়মগুলিকে সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র তাঁর প্রত্যেকটি কর্মে ও সিদ্ধান্তে ধর্মের নীতি-আদর্শকে মূর্ত করে তুলেছেন। রাজা দশরথের প্রথম পুত্র হিসেবেও রামচন্দ্র সদগুণের মূর্ত প্রতীক। নীতি আদর্শকে মেনে চলার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর পিতৃসত্ত্ব পালনের জন্য সিংহাসন, চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস যাত্রা সবই তাঁর ধর্মের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ীর কথার উত্তরে রাম বলেন:

"অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ।।
ভক্ষয়েহয়ং বিষং তীক্ষ্নং পতেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ।।
তদ্ ব্রুহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে।।"[১]

অর্থাৎ-

> "অহো ধিক, দেবী, আমাকে এমন বাক্য বলবেন না। আমি রাজার কথায় অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি, তীক্ষ্ন বিষ খেতে পারি, সমুদ্রেও পড়তে পারি, কারণ ইনি গুরু, পিতা, নৃপ এবং হিতার্থী। অতএব বলুন রাজা কি চান, আমি তাই করব। নিশ্চয় জানবেন, রাম দুরকম কথা বলে না।"

- এই বক্তব্যের দ্বারা শুধু তাঁর নিজের সততাই প্রকাশিত হয় না, বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাঁর আত্মোপলব্ধি প্রকাশিত হয়, যেখানে নিজস্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ অপেক্ষা পরিবার ও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করে। অপর দিকে রাম নিজে বিষ্ণুর অবতার হয়েও ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা ও ভক্তির নিদর্শন দিয়েছেন, ভগবান হয়েও ভগবানকে পূজা করেছেন। তাইতো মেঘনাথবধ কাব্যেও ধ্বনিত হয়:

আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে।[২]

রামায়ণ মহাকাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্রের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধর্মের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করে। লক্ষ্মন রামের একনিষ্ঠ প্রাণপ্রিয় ভাই, যে সুরক্ষা ও আনুগত্যের প্রতীক। রামচন্দ্রের প্রিয়তমা স্ত্রী সীতা সদগুন ও বিশ্বস্ততার প্রতিনিধি। এইসমস্ত চরিত্রগুলি ছাড়াও অন্যান্য চরত্রগুলিও ধর্মের নানা দিক নির্দেশ করে। ধর্মের মূলবিষয়বস্তু স্বতন্ত্র কর্ম ব্যতীত বহুধা বিস্তৃত। এটি ব্যক্তির সমাজে প্রবহমান বিভিন্ন ভূমিকার সঙ্গে আগত বিভিন্ন দায়-দায়িত্বগুলিকে একত্রীভূত করে। এই রামোপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কিপ্রকারে রাজন্যবর্গের ন্যায়বিচারের সহিত রাজ্য শাসন করতে হবে তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

"রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ।।"[৩]

সৈন্যদের ন্যায়-নীতি মেনে সম্মানপূর্বক যুদ্ধ করতে হবে, কীভাবে রাজ্যে বসবাসরত অধিবাসীদের নৈতিক নীতি ও আইন ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে তার প্রত্যেকটি নীতি-আদর্শ তুলে ধরেছে। এভাবেই রামায়ণ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে সাম্যতা বুঝতে পারার একটি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে।

একজন মানুষকে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে তার ব্যাখ্যাও রামায়ণে পাই। ক্ষমতার শীর্ষে উঠেও সব কিছুকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে- এই বার্তা রামায়ণে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। মহৈশ্বর্যে নম্র থাকা, মহাদৈন্যে নত না হওয়ার, সম্পদে ও বিপদে অটল থাকার শিক্ষা আমরা রামায়ণ থেকে পাই। জীবনে যত সম্পদের প্রাপ্তি ঘটে, তাঁর থেকে বেশী দান করতে হবে। এই প্রসেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বলেছেন:

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মানিক্যের অঙ্গদের মতো
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক..."[৪]

ভগবান রামচন্দ্র ও হনুমানের মধ্যে যে সম্পর্ক তা ভক্তির আধ্যাত্মিক নীতিমালার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের অবিচল বিশ্বাস ও ভক্তিই এখানে মুখ্য। এই ভক্তির মাধ্যমেই আসল শক্তি মহান শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেই উদ্ভব হয়। এই ভক্তি কখনো অন্ধবিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং তা ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সুগভীর আত্মিক ভাবের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ভক্ত হনুমানের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রামায়ণ দেখিয়েছে ভক্তি হল নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ। রামের প্রতি হনুমানের অদম্য উৎসর্গ ভক্তির শক্তিকে চিত্রিত করে। সীতাকে উদ্ধার করা এবং রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামকে সাহায্য করা তাঁর নিছক কৃতিত্ব ও বীরত্বের কাজ নয়, যাপ্রেম ও ভক্তির গভীর প্রকাশ। রামায়ণ এই শিক্ষা দেয় যে আন্তরিক ভক্তিসবচেয়ে কঠিন বাঁধা অতিক্রম করতে সাহস যোগায়। কেউ যখন ঐশ্বরিক ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন সে বড় কোন বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করার মত সামর্থ্য অর্জন করে। ভক্তির আধ্যাত্মিক অনুশীলন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আত্মসমর্পণ মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, আত্মসমর্পণ মানে ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ততা, যা আমাদের ধার্মিক ভাবাপন্ন হতে সাহায্য করে ও মোক্ষ প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয়।

বিশেষতঃ হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম মতে মায়া বাস্তব ও বিভ্রমের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। মায়াকে মানুষের কাছে প্রতারণামূলক শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়, যা আমাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে হ্রাস করে দেয়। এই মায়া এমন ভাবে মোহগ্রস্থ করে তোলে যার ফলে স্থায়ী বাস্তবতা ভুলে মানুষ ক্ষণস্থায়ী ঘটনার দিকে অগ্রসর হয়। মানুষের বাস্তব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে মায়া প্রভাবিত করে তার সুন্দর ব্যাখ্যা রামায়ণ তুলে ধরেছে রাবণের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাবণের চরিত্রটি মোহগ্রস্থ প্রলোভনশীল মায়ার শক্তিকে প্রকাশিত করে। তিনি অপরিমিত শক্তিশালী ও অপরাজেয়, তবুও শেষ অবধি আকাঙ্ক্ষা, অধার্মিকতা ও অহংকারের দ্বারা চালিত হয়ে পরাজিত ও নিহত হন। বুদ্ধিমান মানুষকে মায়া কি ভাবে বিপথে চালিত করে এই আখ্যানটির দ্বারা তা আখ্যায়িত হয়েছে। অপর দিকে রামচন্দ্র সত্যের সাধক, মায়ার মোহগ্রস্থতা লঙ্ঘনকারী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর সাথে রাবণের যে যুদ্ধ সেটা শুধু বাহ্যিক যুদ্ধ নয়,

প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধও বটে। রামচন্দ্র তাঁর ধর্মের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে, তাঁর ধার্মিকতার আদর্শকে প্রকাশিত করে তোলেন। প্রকাশ করেন জাগতিক সত্যগুলিকে।

রামায়ণের আরও একটি আলোচ্য বিষয় হল- মৃত্যুই একমাত্র চিরস্থায়ী সত্য। আমাদের আশা-ভরসা, দুঃখ-বেদনা, এমনকি আমাদের প্রিয় বস্তুও একদিন মৃত্যুতেই বিলীন হয়ে যায়। তাইতো দেখি- রাম সুন্দর রাজত্ব ছেড়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। অপরদিকে ব্রহ্মার কথা রাখার জন্য ও অযোধ্যা রাজ্যকে অভিশাপের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লক্ষণ নিজে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। থেকে তাইতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অপূর্ব রামায়ণে' বলেছেন:

> "যেসব জিনিস আমাদের এত প্রিয় যে, কখনো তাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্ত কাল অপেক্ষা করিয়া থাকি।"[৫]

রাবণ বধান্তে সুগ্রীবের ন্যায় বিভীষণের মনেও এক সংশয়ের জন্ম হয়। পাপী ভ্রাতা রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ তাঁর সৎকাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে। রাম তখন বলেন: মৃত্যুতে সমস্ত শত্রুতার মুক্তি ঘটে। তারপর ঘৃণার আর কোন অবকাশ রাখতে নেই। রামচন্দ্রের মতে জগতে ক্ষমার মত শান্তি অন্য কোন কিছুতে নেই। লক্ষ্মণ বিভীষণকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করলে রাম বলেন: বিভীষণকে কেন রাবণকেও আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। তাইতো বাল্মীকি রামায়ণে ধ্বনিত হয়:

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রুতং মম।"[৬]

রামোপাখ্যান মানব জীবনের জটিল সমস্যাগুলিকে সমাধান করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার উপর আলোকপাত করে। হনুমান ও সীতার মত চরিত্রগুলি মোহ-মায়ার বন্ধনপাশ অতিক্রমকারী। ভক্তি, প্রজ্ঞা ও সত্যের সাধনার দ্বারা তাঁরা মোহ-মায়ার বন্ধন ছিন্ন করেছেন। রামায়ণের মায়ার অন্বেষণ জ্ঞানপিপাসুদের নিজস্ব জীবনে তাঁদের যে বিভ্রমের সম্মুখে দাড়াতে হতে পারে সেই সম্পর্কিত চিন্তা করার আহ্বান জানায়। সাথে সাথে আত্মোপলব্ধি, নৈতিকতা, ত্যাগ ও ভক্তির মাধ্যমে মুক্তির সেই পথ বাতলে দেয়। সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রাধান্যের দিক দিয়ে প্রথমে অবস্থান করে রামায়ণ। এই মহাকাব্যটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। এই কালজয়ী মহাকাব্যটি সত্য, ন্যায় ও আধ্যাত্মিকতার মত সার্বজনীন বিষয়গুলিকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে, যা প্রাচীনকালের ন্যায় আজও উন্নত বিশ্বে প্রসঙ্গিকতার দাবী রাখে।

রামায়ণের অন্তরে রয়েছে ধর্মের সুগভীর ধারণা, যা ধর্মপিপাসুদের ধার্মিকতার খোঁজ দেয়। ব্যক্তির নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও আদর্শ কর্তব্যের মধ্যে জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে ফুটিয়ে তোলে করে। রামের চরিত্রে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে। রামায়ণের যুদ্ধ শুধু সীতাকে উদ্ধার করা নয়, এটি একটি নৈতিক যুদ্ধ, যা প্রতিকুলতার সম্মুখে পুণ্যকে টিকিয়ে রাখার উপর জোর দেয়। উপাখ্যানটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, সার্বজনীনরূপে প্রযোজ্য নৈতিক নীতিগুলির অন্বেষণ করতে সাহায্য করে। এটা সততা, ন্যায্যতা ও মানবিক অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ভাবনা উত্থাপিত করে। প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক প্রজন্মকে অন্যায়ের সাথে আপোষ না করতে ও ন্যায়পরায়ণতার নিমিত্ত সংগ্রাম করতে সাহস যুগিয়ে এসেছে রামায়ণ। অন্যায়ের সাথে আপোষহীন সংগ্রামই মানুষের একমাত্র কর্তব্য হওয়া

উচিৎ। এই বিষয়গুলি আমাদের অনুপ্রাণিত করে যা আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের বিদুরের উক্তিতে পাই:

"ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রাম্যর্থে কুলং ত্যজেৎ
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।"[৭]

অর্থাৎ, বংশগৌরবের মান রক্ষার জন্য কোন মানুষকে ত্যাগ করা জেতে পারে, গ্রামকে রক্ষার জন্য বংশকে ত্যাগ করবে, দেশ রক্ষার নিমিত্ত গ্রামকে ও আত্মার কল্যাণ হেতু পৃথিবীকে ত্যাগ করা উচিত।

পৃথিবীতে একা এসেছি, একাই চলে যেতে হবে- এই আধ্যাত্মিক ধারনাও আমরা রামায়ণ থেকে পাই। দেশ, রাজ্য, নাগর, পাড়া ও স্বীয় আত্মীয় পরিজনদের কার উপরেই কারও সম্পূর্ণ স্বত্ব নেই। থাকলেও তা ক্ষণিকের জন্য। ঋষি জনক ব্রাহ্মণকে অধিকার প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন:

> "পৃথিবীস্থ কোনো পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলা নগরীতে ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলী-মধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোনো পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রতীত হইল না।"[৮]

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রতিফলিত হয়- মানুষের শরীর ও মনের মধ্যে সম্বন্ধ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অধিকার বোধ নেই। মানুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও অধিকারহীন জীব মাত্র। কিছু দিনের জন্য আমরা পৃথিবী নামক রঙ্গমঞ্চে এসেছি অভিনয় করতে। অভিনয় শেষ হলে আবার ফেরার পালা। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'অনধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন:

> "আমাদের শরীর ও মনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের অধিকার নাই। আমরা নিতান্ত দরিদ্র...।"[৯]

প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত লোকবিশ্বাস শ্রীরামের স্মরণে গেলে বারংবার আমাদের এই নশ্বর দেহ ধারণ থেকে মুক্তি পাবো। তাইতো প্রতিটি গৃহস্থের ঘরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও পারলৌকিক শ্রদ্ধানুষ্ঠানে রামায়ণ পাঠ করা হয়। তাইতো কৃত্তিবাস আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেছেন:

"রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বছর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।।
রাম নাম স্মরিলে যমের দায় তরি।
শ্রীরামের প্রীতি ভাই মুখে বল হরি।।"[১০]

এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণও পাওয়া যায়। দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে ওঠা, অহল্যার পাথরের মূর্তি থেকে মানব শরীর ধারণ করা- এই রকম অনেক প্রমাণ রামায়ণের আখ্যানগুলিতে ছড়িয়ে আছে। রাম নামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের জনৈক মহারাজ বলেছেন-

> "রামনামের মুর্ছনায় মানবমনের আনন্দবর্ধন হয়। রামনামের মহিমা ব্যাখ্যায় এই রামরহস্য আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে শুধু রাজা তার ধর্মপথ, জ্ঞানপথ, দানধ্যান বৈরাগ্যের পরকাষ্ঠায় রামনামের দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ করবেন না, যোগিগণ, উপাসকগণ, যার এই রামনামে রুচি হবে তিনিই এক অপূর্ব ভাব বা হৃদয়ের ঐশ্বর্যলাভ করবেন।"[১১]

বেদব্যাসকৃত অষ্টাদশ পুরাণের মুখ্য বিষয় হল পাপ-পুন্যের হিসাব। পুরাণে জগতের সমস্ত পাপ পুণ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে আপরকে সাহায্য করা হল পুণ্য আর অপরকে পীড়াদানই হল পাপ।

এই সাহায্য বা উপকারের প্রত্যুপকার নেওয়া সমাজে শোভা পায়না। কিন্তু উপকার গ্রহীতার উচিৎ উপকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। রামায়ণেও দেখি রামের অভিষেকের পর হনুমান বিদায় নেবার পালা। হনুমানের সামনে দাড়িয়ে রাম বলছেন: 'কপিবর! তমার এক একটি উপকারের পরিবর্তে আমি প্রান দিতে পারি, সুতরাং অবশিষ্ট উপকারের জন্য ঋণী রইলাম।'- এই মানবিক মূল্যবোধও আমরা রামায়ণ থেকে পাই।

উপসংহার: রামায়ণের আধ্যাত্মিক ধারণা মূলত ঐশ্বরিক নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের এক অনন্য মেলবন্ধন। এখানে ধর্ম, সত্য, ন্যায় ও কর্তব্য পালনকে ঐশ্বরীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, দয়া, আনুগত্য ও আত্মত্যাগের মতো মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে সমাজকে নৈতিকভাবে সুসংহত করার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বয় রামায়ণকে কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক নির্দেশিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা ব্যক্তিগত কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্বকে একত্রে যুক্ত করে মানবজীবনের পূর্ণতা অর্জনের পথ দেখায়। অতএব বলা যায়, রামায়ণের আধ্যাত্মিক দর্শন আজও মানবসমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি আমাদের শেখায় যে প্রকৃত জীবনদর্শন তখনই গড়ে ওঠে, যখন ঐশ্বরীক আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ একে অপরের পরিপূরক হয়। আর প্রকৃত জীবন দর্শনের মাধ্যমেই আমরা পরম পুরুষের সাথে একাত্ম হতে পারি। তাই বলা হয়- "ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"

তথ্যসূত্র:

১। বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ, রাজশেখর বসু, পৃঃ-৮২।
২। মেঘনাথবধ কাব্য জিজ্ঞসা, শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ-৮৯।
৩। বাল্মীকি রামায়ণ, অয্যোধ্যা কাণ্ড - ৬৭/৩৪।
৪। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বারিদবরণ ঘোষ, পৃঃ- ৭৯।
৫। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বারিদবরণ ঘোষ, পৃঃ- ৬৪।
৬। বাল্মীকি রামায়ণ, ৬.১৮.৩৩।
৭। রামায়ণ কথা, স্বামী তথাগতানন্দ, পৃঃ- ১৪১।
৮। মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশ্বমেধিক পর্ব,পৃঃ- ৪২।
৯। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বারিদবরণ ঘোষ, পৃঃ- ৯৪।
১০। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বিরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পৃঃ- ২২৬।
১১। বঙ্গভূমিতে রামায়ণ চর্চার ঐতিহ্য, পৃঃ-৫০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। করণ, সুধীরকুমার। রামায়ণের বিশ্বায়ন। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২।
২। বসু, রাজশেখর। বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ডসন্স, ১৯৯০।
৩। ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র। বাল্মীকি-রামায়ণ। কলকাতা, ভারবি, ১৯৭৮।
৪। সেন, দীনেশচন্দ্র। রামায়ণী কথা। কলকাতা, পাতাবাহার, ১৪১৬ বং।
৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট

লিমিটেড, ২০১০।

৬। ভট্টাচার্য, শ্রীশিবপ্রসাদ। মেঘনাথবধ কাব্য জিজ্ঞসা। কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃলিঃ, ১৩৬৬ বং।

৭ ।বরকত, হিমেল। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স,২০১২।

৮। কর্মকার, সপ্তদীপা। প্রসঙ্গ বাংলা রামায়ণ। কলকাতা, দোসর পাবলিকেশন, ২০২২।

৯। চক্রবর্তী, তনিমা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার লোকঐতিহ্য। কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০১১।

১০। তর্করত্ন, পঞ্চানন। অধ্যাত্ম-রামায়ণ। কলকাতা, বিহারীলাল সরকার, ১৮৮৮।

১১। মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ। রামায়ণ যুগের ভারত। কলকাতা, নির্মলচন্দ্র ঘোষ, ১৩১৯ বং।

১২। ঘোষ, তপন কুমার। জন্মভিত্তিক জাতি ও বর্ণ এবং রামের শক্তিপথ। কলকাতা, তুহিনা প্রকাশনী, ১৪২১ বং।

১৩। তর্কভূষণ, চন্দ্রকান্ত। রঘুবংশ। কলকাতা, সংস্কৃত প্রেস, ১৮৬৯।

১৪। ঘোষ, বারিদবরণ। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। করুণা প্রকাশনী, ২০০৮।

১৫। সিংহ, কালিপ্রসন্ন। মহাভারত (অনুবাদ)। ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কলকাতা, ১৭৮১ শকাব্দ।